বাংলা ভাষাচর্চায় বাঙালি আই.সি.এস. রমেশচন্দ্র দত্ত

বলরাম দাস,ইতিহাস বিভাগ, বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয় ,

ইমেল : das.balaram1984@gmail.com

সারসংক্ষেপ

রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন দ্বিতীয় বাঙালি আই. সি. এস. (১৮৭১)। তাঁর পরিবার ছিল পশ্চিমী সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। রমেশচন্দ্র নিজে তাঁর পরিবার ও সমসাময়িক শহুরে সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন ইংরেজি শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'। শৈশব জীবনে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্য চর্চার মাধ্যামে নিজের যশ ও খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জীবনের একটি নির্দিষ্ট গণ্ডী পেড়িয়ে তিনি ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার প্রতি সমান মনোনিবেশ করতে শুরু করেছিলেন। এখন প্রশ্ন হল – কেন ও কী ভাবে তিনি বাংলা ভাষা চর্চার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন? বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত একাধিক সাহিত্য, উপন্যাস, গ্রন্থ ও প্রবন্ধ কতখানি সমসাময়িক (উনিশ শতক) ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সমাজ, অর্থনীতি ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় অনুঘটক হিসেব কাজ করেছিল? এই একাধিক প্রশ্নের অনুসন্ধান এই প্রবন্ধের মধ্যে করা হয়েছে।

শব্দ সূচক:বাংলা ভাষা, জাতীয়তাবাদ, পরিবার, পশ্চিমী সংস্কৃতি, 'আরকাইড', ঋগ্বেদ, উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সমকালীন সমাজ ও পরিবার রমেশচন্দ্র দত্তকে শৈশব ও যৌবনে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ আগ্রহী করে তুলতে সাহায্য করেছিল।ক্রমশ তিনি ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি বিশেষ উৎসাহ দেখাতে শুরু করেছিলেন। প্রাথমিক জীবনে পশ্চিমী সংস্কৃতি ও ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অতিমাত্রায় আকর্ষণের পিছনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল নিজের পরিবারের সদস্যবর্গ। রমেশচন্দ্রের পিতৃব্য শশীচন্দ্র দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং সর্বোপরি তাত-ভগিনীদ্বয় অরু ও তরু দত্ত ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চা ও নিজস্ব রচনা করেই জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছেছিলেন। রমেশচন্দ্র নিজেও ইংরেজি সাহিত্যচর্চার মাধ্যামে নিজের যশ ও খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

ইংল্যান্ডে থাকাকালীন রমেশচন্দ্রের পিতৃব্য গোবিন্দ চন্দ্র *Dutt Family Album* গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করতে শুরু করেছিলেন। শেষপর্যন্ত, ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসকদের বর্ণনা থেকে শুরু করে মোট ৬৮ ধরনের বিষয় নিয়ে গোবিন্দ চন্দ্র ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে *Dutt Family Album* গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন।[১]তরু দত্তের *A Sheaf Gleaned in French Fields* (**১৮৭৬**)নামক কবিতার গ্রন্থ সম্বন্ধে ইংল্যান্ডের *এথিনিয়ম* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে, এই ধরনের কবিতা রচনা যে কোন উচ্চ শিক্ষিতা ইংরেজ মহিলার পক্ষে গৌরব-জনক।[২] পরিবারের এই জনপ্রিয়তার আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে রমেশচন্দ্র লালবিহারী দে'র *Bengal Magazine* (১৮৭৪) ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের*Mookerjee's Magazine*-এ 'আরকাইড' (*Arcydae*)ছদ্মনামে ইংরেজিতে প্রবন্ধ রচনা শুরু করেছিলেন।[৩]

কেবল রামবাগানের দত্ত পরিবারই নয়, উনিশ শতকে বঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষিত পরিবার বাংলা ভাষা চর্চার তুলনায় ইংরেজি ভাষা চর্চা করাকেই গৌবর বলে মনে করতেন। ফলে তাঁদের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে নিজেদেরকে ইংরেজি কবি-সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত করার প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করেছিল। সংস্কৃতানুরাগীদের কাছে বাংলাভাষা ছিল স্ত্রীলোকের আলোচ্য ভাষা। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, শিক্ষিত বাঙালি জনগণ বাংলা পড়তে চান না। ফলে মাতৃভাষা তাঁর সন্তানদের দ্বারায় সম্পূর্ণ অবজ্ঞা পেতে শুরু করেছিল।[৪]

অন্যদিকে রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আশার ফলে তিনি তাঁর চিন্তাভাবনার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করেছিলেন। জীবনের একটি নির্দিষ্ট গণ্ডী পেড়িয়ে রমেশচন্দ্র ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার প্রতি সমান মনোনিবেশ করতে শুরু করেছিলেন। একথা ঠিক যে, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তন করে ইংরেজি ভাষায় নিজস্ব রচনা প্রারম্ভ করেছিলেন। কিন্তু তার কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলা ভাষা চর্চা করতে শুরু করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পাশাপাশি রমেশচন্দ্র সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যিকগণের রচনা পাঠ করতে আরম্ভ করেছিলেন।এই সাহিত্যিকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন - রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,ক্ষেত্রমোহন মুখার্জী, রামকমল সেন, গোবিন্দ চন্দ্র সেন, বিশ্বেশ্বর দত্ত, তারাচাঁদ দত্ত, রঙ্গলাল ব্যানার্জী, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের রচনায় যেভাবে ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী জাতীয়তাবাদের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছিল, তার দ্বারা রমেশচন্দ্র প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৫]ফলে রমেশচন্দ্র উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন যে

সাধারণ বঙ্গবাসী ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞ নন। তাই ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্য ও ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রকৃত চিত্র সাধারণ জনমানসে উত্থাপন করতে হলে বাংলা ভাষা একমাত্র মাধ্যম। এসময় তিনি বাংলা ভাষায় ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বাস্তবরূপকে সাধারণ মানুষের সম্মুখে তুলে ধরবেন বলে সংকল্প করতে শুরু করেছিলেন। আর তারই বাস্তব পরিণতি রমেশচন্দ্র দত্তের বাংলা ভাষা চর্চা ও সাহিত্য এবং প্রবন্ধ রচনা।

কেবল সমকালীন রচনাকারদের রচনা নয়, বরং সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং প্রতিষ্ঠানের চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। *সমাচার দর্পণ*(প্রথম সংখ্যা- ২৩শে মে, ১৮১৮), *দিকদর্শন*(এপ্রিল, ১৮১৮) প্রমুখ বাংলা সংবাদপত্রে ঔপনিবেশিক বঙ্গের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, ভারতবাসীর দুর্বলতা, বাণিজ্যের অবনতি তুলে ধরা হয়েছিল। *School Book Soceity* (১৮১৭), *Society for the Acquisition of General Knowledge* (১৮৩৮)-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি হয়ে উঠেছিল একদল শিক্ষিত যুবকদের আনাগোনা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ধারার চর্চার কেন্দ্র।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে,বাঙালিদের ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রবণতাকে বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ইংল্যান্ডে তিন বছর (১৮৬৮-৭১)অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি তাঁর ইউরোপে তিন বছরঅতিবাহিত করার অভিজ্ঞতা *Three Years in Europe* (১৮৭২) নামে ইংরেজিতে রচনা করলে বঙ্কিমচন্দ্র তা সমালোচনা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে রমেশচন্দ্র উক্ত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ *ইউরোপে তিন বৎসর*(১৮৭৩) নামে প্রকাশ করেন। রমেশচন্দ্র বাংলাভাষায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করায় বঙ্কিমচন্দ্র 'আপ্যায়িত' হন – যা তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র)দ্বিতীয়বার *বঙ্গদর্শনের* 'প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' অংশে (চৈত্র, ১২৮০ বঙ্গাব্দে) উল্লেখ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র ইংরেজি ভাষা না জানা পাঠকদের জন্য এই বঙ্গানুবাদ রচনা করেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন।[৬]

রমেশচন্দ্র নিজে ছিলেন একজন সিভিল সার্ভেন্ট। ফলে তাঁর পক্ষে সরাসরি ব্রিটিশ প্রশাসনের সমালোচনা করা সম্ভব ছিল না। বিকল্প মাধ্যম হিসেবে তিনি সাহিত্য রচনাকে বেছে নিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত বাংলা ভাষার গুরুত্বকে তিনি উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, বাংলা রচনার মাধ্যমেই সাধারণ বঙ্গ ও ভারতবাসীকে (বাংলা ভাষা জানা) জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব।ফলে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে *ইউরোপে তিন বৎসর*গ্রন্থ রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা রচনার যে পথযাত্রা শুরু করেছিলেন তার চলমানতা দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলেছিল। ক্রমশ রচনা করতে শুরু করেছিলেন একাধিক প্রবন্ধ, সাহিত্য, অনুবাদ রচনা ও সর্বোপরি উপন্যাস।

সুতরাং রমেশচন্দ্রের বঙ্গালা ভাষা চর্চার প্রতি মনোনিবেশ ও তা বাস্তবায়নে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-চেতনা, উক্ত সংবাদপত্র, প্রতিষ্ঠান ও সমসাময়িক বাংলা রচনাকারদের রচনা। তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি বাংলা সাহিত্য রচনা প্রারম্ভ করেছিলেন। যদিও অনেকে দাবি করেন যে, কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রমেশচন্দ্র বাংলায় সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের উল্লেখিত একটি ঘটনার কথা তাঁরা উল্লেখ করা থাকেন। রমেশচন্দ্রের উদ্ধৃত এই ঘটনাটি হল --

বঙ্কিমবাবু তখন *বঙ্গদর্শন* বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ভবানীপুরে একটি ছাপাখানা হইতে ঐ কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, তথায় বঙ্কিমবাবু সর্বদা যাইতেন। সেই ছাপাখানার নিকটে আমার বাসা ছিল, বলাবাহুল্য বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম তাহা বলাবাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন– যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালোবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লেখনা কেন? আমি বিস্মিত হইলাম! বলিলাম– আমি যে বাঙ্গালা লেখা কিছুই জানি না! ইংরাজি বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভালো করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনো বাঙ্গালা রচনা-পদ্ধতি জানি না! গম্ভীরস্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন, রচনা-পদ্ধতি আবার কি – তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাই রচনা-পদ্ধতি হইবে! তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে! এই মহৎ কথা বরাবরই আমার মনে জাগরিত রহিল।[৭]

পরবর্তীকালে (১৮৭২ নাগাদ) উভয়ের মধ্যে পুনরায় দেখা হলে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন যে, ইংরেজি রচনার মাধ্যমে তিনি (রমেশচন্দ্র)কখনই অমর হতে পারবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রকে তাঁর পিতৃব্য গোবিন্দচন্দ্র, শশীচন্দ্র এবং মধুসূদন দত্তের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, গোবিন্দচন্দ্র, শশীচন্দ্রের ইংরেজি কবিতা কখনই জীবন্ত থাকবে না, তুলনায় বাংলা ভাষা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন মধুসূদন দত্তের বাংলা কবিতা জীবন্ত থাকবে।[৮]

এর ঠিক দু'বছর পর রমেশচন্দ্র প্রথম বাংলাভাষায় *বঙ্গবিজেতা* (১৮৭৪) উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন, তার পিছনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কাজ করেছিল বলে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছিলেন।[৯] প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন যে, উনিশ শতকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের যে অগ্রগতি হয়েছিল তা এই শতকের শেষার্ধে রমেশচন্দ্রের দ্বারা আরো একধাপ অগ্রসর হয়েছিল।[১০]

এসময় রমেশচন্দ্র নিজে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে অগ্রজযোগেশচন্দ্র দত্তকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, মাতৃভাষাই এখন তাঁর উপাস্য। তাঁর আশা, এ সংসার থেকে বিদায়-গ্রহণকালে তিনি এরূপ কিছু রেখে যাবেন, যা তাঁর জীবনান্তে বহুকাল ধরে স্বদেশবাসীগণের চিত্ত-বিনোদন করবে।[১১]

রমেশচন্দ্র আক্ষেপ করে **বলেছিলেন যে, উনিশ শতকে বাংলা ও সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার চর্চা, শিক্ষা গ্রহণ ও কথাবলার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি অবহেলিত হতে শুরু করেছিল।** রমেশচন্দ্রের কাছে মনে হয়েছিল, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের শ্রষ্টা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র,অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ যে ভাবে বাংলাভাষায় সাহিত্যসেবা করে চলেছিলেন, তা প্রকারন্তরে মাতৃভূমির সেবা। উক্ত ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় নিজেদের কবিতা, সাহিত্য, প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচনা করেছিলেন -- যা ঔপনিবেশিক সময়কালে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে রমেশচন্দ্রের কাছে মনে করেছিলেন। রমেশচন্দ্র নিজে তাঁদের প্রতি ঋণ স্বীকার করেছিলেন। কারণ এঁরাই ভারতবাসীকে ভারতবর্ষের সাহিত্য, পুরাতত্ব ও সনাতন ধর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শিখিয়েছিলেন। তাঁদের মতো রমেশচন্দ্রও গণ্য হতে চেয়েছিলেন। এসময় সরকারি কাজ অপেক্ষা গ্রন্থ পাঠেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি।[১২]

রমেশচন্দ্রের বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার বিভিন্ন পর্যায়

রমেশচন্দ্রেরবাংলাভাষায় সাহিত্য চর্চা ওরচনাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে – প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ।

(ক) প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্যচর্চা

ঔপনিবেশিক কালপর্বে ইউরোপীয়গণের একাংশ ভারতবর্ষকে ‘অসভ্য, বর্বর, নিকৃষ্ট’ বলে আখ্যা দিতে শুরু করেছিলেন। তার প্রতিবাদে রমেশচন্দ্র ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্য, গৌরব গাঁথা, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেছিলেন। ইউরোপে বসবাসকারী একাংশ আর্য জাতির ব্যবহৃত ‘সংস্কৃত’ ভাষার উৎপত্তি স্থল ভারতবর্ষের উত্তরাংশ বলে রমেশচন্দ্র মন্তব্য করে**ছিলেন**।[১৩] ভারতবর্ষে বসবাসকারী আর্যদের ‘সংস্কৃত’ ভাষায় রচিত ‘*ঋগ্বেদ*’(১৫০০-১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ‘সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম গ্রন্থ’ বলে রমেশচন্দ্র লিখেছিলেন।[১৪]রমেশচন্দ্রের এইরূপ চিন্তা-চেতনার মধ্যে একপ্রকার জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল – যা ঔপনিবেশিক যুগে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

রমেশচন্দ্র বলে**ছিলে**ন যে, ধর্ম ও রাজনীতির পরিবর্তন ভাষার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। মগধ সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিবাদী ধর্মান্দোলনের সময়কালে উত্তর ভারতে সংস্কৃত ভাষার রূপান্তর ঘটে ‘পালি’ ভাষা কথ্যভাষা হিসেবে আবিভূত হয়েছিল। রমেশচন্দ্রের কথায়, ‘the Pali language was recognized as the spoken tongue of Northern India.’[১৫] তিনি বলে**ছিলে**ন যে, খ্রিস্টাব্দের প্রথম শতক থেকে ‘পালি’ ভাষা ‘প্রাকৃত’ ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে জনগণের কথ্য-ভাষা রূপে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল।[১৬]

রমেশচন্দ্র বলে**ছিলে**ন, ‘The Bengali language is thus a descendant of Sanscrit, the mother of language.’[১৭] তিনি আরো বলে**ছিলে**ন যে ‘সংস্কৃত’ ভাষার পরবর্তীরূপ ছিল ‘মাগধী প্রাকৃত’ আর এই ‘মাগধী প্রাকৃত’ ভাষার রূপান্তর হয়ে ‘বাংলা’ ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল।[১৮] তিনি পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের ব্যবহৃত বাংলা ভাষার রূপান্তরের প্রক্রিয়াটিকে উল্লেখ করে দেখিয়ে**ছিলে**ন,

সারণি: (১). বাংলা ভাষার রূপান্তরের প্রক্রিয়া

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাংলা
অস্তি	**অচ্ছি**	**আছে**
অদ্য	**অজ্জ**	**আজ**
কার্য্য	**কজ্জ**	**কাজ**
সন্ধ্যা	**সঞ্ঝা**	**সাঁঝ**
হস্ত	**হত্থ**	**হাত**

সূত্র: Dutt, R. C. *The Literature of Bengal*,(Reprint 1895). Calcutta: Thacker Spink &Co.,1877. p.3.

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন যে, সরাসরি ‘মাগধী প্রাকৃত’ ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয় নি, ‘মাগধী প্রাকৃত’-এর পরিবর্তীত রূপ ‘মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ’ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।[১৯] তবে রমেশচন্দ্রের মন্তব্য আধুনিককালে গ্রহণযোগ্য না হলেও উনিশ শতকের শেষার্ধে গুরুত্বের দাবি রেখেছিল।

ঋগ্বেদ সংহিতা

রমেশচন্দ্র প্রাচীন ভারতবর্ষের উপর রচনা ও অনুবাদ করেছিলেন একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ। *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (১৮৮৭) ও *ঋগ্বেদের দেবগণ*(বৈশাখ ১২৯৩) ছিল তাঁর সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ। তৎকালীন সময়ে, হিন্দুদের মধ্যে ঋগ্বেদ নিয়ে চর্চা কমে গেলেও বিশ্বের অন্যান্য জাতির কাছে বিশেষ করে জার্মান, ফরাসী,

ইংরেজ, আমেরিকাবাসী, ইতালীয় ও গ্রীকদের মধ্যে কেন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে রমেশচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছিলেন।[২০]

বিশ্বের সর্বকালের প্রাচীন গ্রন্থ 'ঋগ্বেদ'বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশে শিক্ষিত সমাজে কতখানি সমাদৃত ও গুরুত্ব পেয়েছিল তা বেশ কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে রমেশচন্দ্র বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে প্রাচীন গ্রন্থ *ঋগ্বেদ-সংহিতা*। তিনি বলেছিলেন যে, 'ঋগ্বেদ'আলোচনা না করলে অন্যান্য আর্যদের ধর্ম প্রণালী বোঝা সম্ভব নয়, মানব জাতির প্রকৃত ইতিহাস যাঁরা পাঠ করতে চান 'ঋগ্বেদ'তাঁদের উৎকৃষ্ট উপায়। আর্য-ধর্ম যাঁরা আলোচনা করতে চান, আর্য-চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রকৃত অর্থ যাঁরা গ্রহণ করতে চান, আর্য-ইতিহাসের মূল উৎপত্তি ও বৃদ্ধি যাঁরা অবগত হতে চান, 'ঋগ্বেদ'তাঁদের একমাত্র উপায়।[২১]

বাংলা ভাষায় *ঋগ্বেদ*-এর অনুবাদ রচনায় রমেশচন্দ্রকে নানান প্রতিকূল সমস্যার মুখাপেক্ষী হতে হয়েছিল।[২২] রমেশচন্দ্র অব্রাহ্মণ হওয়ায় গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ এই অনুবাদকে সহজ ভাবে মেনে নেন নি। তবে ভারতবর্ষে ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ গোঁড়া রক্ষণশীলদের সমালোচনার মুখে পড়লেও আধুনিক ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মীয় জীবনে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিয়ে এসেছিল। উনিশ শতকে অনেকেই সংস্কৃত চর্চা করলেও, সংস্কৃত না জানা সাধারণ মানুষের জন্য রমেশচন্দ্র এই অনুবাদ রচনা করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অনুবাদ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, অতীতের এই ধর্মীয় ইতিহাস ও 'অমূল্য রতনের ন্যায় সাহিত্য আমাদের গ্রহণ করা জন্মগত অধিকার, অথচ করি নি, কিন্তু আজ আমাদের সামনে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছে, এ আমাদের পরম পাওনা, আর এটি পেয়েছি রমেশচন্দ্রের হাত ধরেই'।[২৩]

ঋগ্বেদের দেবগণ

প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ কী ভাবে ঈশ্বরকে চিনল, তাদের ধর্ম বিশ্বাস, উপাসনা পদ্ধতি, সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও সভ্যতা কিরূপ ছিল প্রভৃতি সম্বন্ধে *ঋগ্বেদের দেবগণ* প্রবন্ধে রমেশচন্দ্র বিবরণ দিয়েছিলেন।তিনি বলেছিলেন, এই 'ঋগ্বেদে'র উপর ভিত্তি করে বিশ্বের অন্যান্য আর্যগণ তাঁদের দেবগণের চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন- ঋগ্বেদের আকাশের দেবতা 'দ্যু' তিনিই গ্রীকদের 'জিউস', লাতিনদের 'জুপিটর', অ্যাংলো-স্যাক্সনদের 'টিউ' এবং জার্মানদের 'জিও'। আবার যিনি ঋগ্বেদের 'বরুণ' তিনিই গ্রীকদের 'ইউরেনাস'। যিনি ঋগ্বেদের 'অগ্নি' তিনিই লাতিনদের 'ইগনিস', স্লাবদের 'অগনি'। যিনি ঋগ্বেদের 'মিত্র' তিনিই ইরাণীয়দের

'মিত্র'। ঋগ্বেদে যিনি 'বায়ু' তিনিই ইরানীয়দের 'বায়ু'। ঋগ্বেদের পর্জ্জন্য (বৃষ্টিদাতা) তিনিই লিথুনীয়দের 'পর্জন্য'। ঋগ্বেদের 'ঊষা' তিনিই গ্রীকদের 'ইয়োস', লাতিনদের 'অরুরা'। যিনি ঋগ্বেদের 'অহনা' (ঊষা) তিনিই গ্রীকদের 'অ্যাথেনা'। ঋগ্বেদের 'সূর্য'ই ছিলেন ইরানীয়দের 'খোরসেদ', গ্রীকদের 'হেলিয়স', লাতিনদের 'সোল'।[২৪]

অন্যান্য আর্যদের ধর্মীয় গ্রন্থে ব্যবহৃত দেবতাদের নাম ভারতীয় আর্যদের ব্যবহৃত দেবতার নাম থেকে ধার নেওয়া বলে রমেশচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন।[২৫]রমেশচন্দ্র এইরূপে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে ছিলেন। একদা ভারতবর্ষও যে ইউরোপ থেকে অনেকাংশে অগ্রগামী ছিল, তা প্রবন্ধের মাধ্যমে উল্লেখ করেছিলেন। সুতরাং সমসাময়িক হিন্দু আর্যদের ধর্ম, সমাজ, দেব-দেবীর চরিত্র ও নামের পরিবর্তন জানতে রমেশচন্দ্রের অনুবাদিত *ঋগ্বেদ-সংহিতা* ও *ঋগ্বেদের দেবগণ* ছিল বাঙালি পাঠকের কাছে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ।[২৬]আসলে রমেশচন্দ্র বঙ্গবাসীগণকে স্বজাতিত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। একদা ইউরোপীয় জাতির তুলনায় ভারতীয় জাতি শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে বহমান ছিল, তথচ ভারতবর্ষ সেই ঐতিহ্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। আর এর পিছনে ভারতবাসীর দুর্বলতাকেই রমেশচন্দ্র দায়ি করেছিলেন।

হিন্দুশাস্ত্র

রমেশচন্দ্র পাঁচ বছর ধরে (১৮৯৩-৯৭) হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের সারাংশ বিভিন্ন পণ্ডিতদের সাহায্যে বঙ্গানুবাদ করে দুই খণ্ডে *হিন্দুশাস্ত্র*(১-৯ ভাগ) গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। ১২৯৯ বঙ্গাব্দ নাগাদ একদা বঙ্কিমচন্দ্রকে কথায় কথায় রমেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, সকল ধর্মাবলম্বীদের ব্যবহার উপযোগী যেরূপ একখানি ধর্মগ্রন্থ (*ঋগ্বেদ সংহিতা*) আছে, সেরূপ আবালবৃদ্ধ হিন্দুমাত্রেই হিন্দুনীতি সম্পর্কে শিক্ষা নিতে পারে এরূপ হিন্দুশাস্ত্র সমূহের সার সংগ্রহ করে হিন্দুদের প্রাত্যহিক ব্যবহার উপযোগী একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব কি না? 'অন্যে যে প্রস্তাবে সঙ্কুচিত হইত, কার্য্যে ভীত হইত বঙ্কিমচন্দ্র সেরূপ প্রস্তাব শুনে আনন্দিত হইলেন'।[২৭]নিম্নে *হিন্দুশাস্ত্র*গ্রন্থের পাঠ্যসূচি ও রচনাকারদের নাম উল্লেখ করা হল।

সারণি: (২). *হিন্দুশাস্ত্র*গ্রন্থের পাঠ্যসূচি ও রচনাকারের নাম

খণ্ড	অধ্যায়ের নাম	রচনাকারের নাম
প্রথম খণ্ড	১ম ভাগ, বেদ সংহিতা	সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্ত
	২য় ভাগ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ	ঐ
	৩য় ভাগ, শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র	ঐ
	৪র্থ ভাগ, ধর্মশাস্ত্র	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
	৫ম ভাগ, ষড় দর্শন	কালীবর বেদান্তবাগীশ
দ্বিতীয় খণ্ড	৬ষ্ট ভাগ, রামায়ণ	হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন
	৭ম ভাগ, মহাভারত	দামোদর বিদ্যানন্দ

	৮ম ভাগ, শ্রীমদ্ভগবদগীতা	ঐ
	৯ম ভাগ, অষ্টাদশ পুরাণ	আশুতোষ শাস্ত্রী ও হৃষীকেশ শাস্ত্রী

সূত্র: দত্ত, রমেশচন্দ্র। *হিন্দুশাস্ত্র*(প্রথম খণ্ড)। কলিকাতা : এল্মপ্রেস,১৩০২ বঙ্গাব্দ। সূচিপত্র।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে যেখানে ইংরেজগণ খ্রিস্টধর্ম প্রচার, ধর্মান্তরের প্রচেষ্টা, ইংরেজি ভাষার প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সে ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের এই প্রচেষ্টা গুরুত্বের দাবি রেখেছিল। তিনিসকল ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করাই তোমাদের পরম আনন্দ, হিন্দু ধর্ম পালন করাই তোমাদের জীবনের ব্রত, তবে এপুস্তকখানি (*হিন্দুশাস্ত্র*) হাতে করিয়া তোমরা আনন্দ লাভ করিবে, শাস্ত্র কথাগুলি পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিবে, কেবল সেই ভরসায় আমার এই কার্য্যফল তোমাদিগকেই উৎসর্গ করিলাম।[২৮]

(খ) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সাহিত্যচর্চা

রমেশচন্দ্রের কাছে উনিশ শতক ছিল জ্ঞানদীপ্ত ও বিবর্তনের যুগ। তা সত্ত্বেও মধ্যযুগের সাহিত্যিক ও রচনাকারদের তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরাম ও অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্রকে একাসনে বসিয়েছিলেন।[২৯] ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরামের রচনার বৈশিষ্ট্য ও গুণগতমান কতখানি ছিল, উভয়ের মধ্যে - কাঁর রচনা শ্রেষ্ঠ তা মাঘ, ১৩০১ বঙ্গাব্দে *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*য় রমেশচন্দ্র 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন। বাংলার পাঠকগণ মুকুন্দরাম, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মধুসূদন প্রমুখের তুলনায় ভারতচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যা দিলেও, রমেশচন্দ্র তা দেন নি।[৩০]

রমেশচন্দ্র বলেন যে, ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাছে ঋণী। কারণ, মুকুন্দরামের কবিত্ব ভারতচন্দ্র পাতায় পাতায় নকল করেছিলেন। মুকুন্দরামের কাব্য সরল, স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য। নারীরা নিজের মন্দ ভাগ্যের জন্য আক্ষেপ করেছে বটে কিন্তু পতি সেবাই তাদের পরম ধর্ম বলে মুকুন্দরাম কাব্যে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র নারীদের মন্দভাগ্যের জন্য পতিনিন্দা করিয়েছেন। রমেশচন্দ্র বলে**ছিলে**ন যে, রায়গুণাকরের কাব্য অধিকতর সুললিত, কিন্তু 'কৃত্রিম, অস্বাভাবিক ও অনেকাংশে ভদ্র সমাজে অপাঠ্য'। সতী ও দক্ষযজ্ঞের কথা নিয়ে উভয় কবির কাব্য আরম্ভ হয়েছিল। শিবের নিকট অনুমতি না পেয়ে অভিমানিনী সতী দক্ষালয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক বর্ণনা দিয়েছেন মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র। এইস্থানে সতীর দশরূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভারতচন্দ্রনিজের চাতুর্য ও পাণ্ডিত্য দেখান বলে রমেশচন্দ্র উল্লেখ করে**ছিলে**ন।[৩১]

(গ) আধুনিক ভারতবর্ষের সাহিত্যচর্চা

রমেশচন্দ্র ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র দুই খন্ডে *The Economic History of India: Under Early British Rule 1757-1837* (১৯০২) ও *The Economic History of India: In the Victorian Age 1837-1900*(১৯০৪) গ্রন্থের মাধ্যমে সমগ্র ইংল্যান্ড ও ইউরোপীয় জনগণের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। যে ব্রিটিশ সরকার গণতন্ত্রের কথা বলেন তাঁরাই আবার উপমহাদেশগুলির গণতন্ত্রে আঘাত আনে। গ্রন্থদ্বয় ইংরেজি ভাষায় রচিত হওয়ায় ইংরেজি না জানা সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব ছিল না।তাই এইরূপ গণতান্ত্রিক আদর্শের বক্তব্য বাংলাভাষী সাধারণ জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য রমেশচন্দ্র বাংলা ভাষায় একাধিক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রচনা করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'ব্রিটিশ শাসনের ভারতীয় শিল্পের অবনতি'(*ভারতী,* শ্রাবণ ১৩০৮), 'ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা' (*ভারতী,* ফাল্গুন ১৩০৮), 'ভারতীয় দুর্ভিক্ষ : তাহার কারণ ও প্রতিকার'(*ভারতী,* আষাঢ় ১৩০৮), 'বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত' (*ভারতী,* পৌষ ১৩০৮), 'ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল' (*ভারতী,* আষাঢ় ১৩০৮), 'ভারতবাসীর দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের কারণ' (*প্রভাত,* জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭)।

বাংলা ভাষায় ঔপনিবেশিক শাসকদের অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাসকে তুলে ধরে রমেশচন্দ্র নিজের রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিনি নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কখনই ভারতবর্ষ থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান চান নি। বরং ব্রিটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় ভারতবর্ষের সংস্কারের দাবি জানিয়ে এসেছিলেন। নিজের একাধিক বাংলা ও ইংরেজি রচনায় ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে এসেছিলেন।

রমেশচন্দ্রের বাংলা ভাষায় রচিত উপন্যাস

রমেশচন্দ্রের বাংলা ভাষা চর্চার সর্বোচ্চ পরিণতি ছিল উপন্যাস রচনা। তিনি সর্বোমোট ছয়টি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। বাংলাভাষায় লিখিত তাঁর ছয়টি উপন্যাস ছিল যথাক্রমে ***বঙ্গবিজেতা***(১৮৭৪),*মাধবীকঙ্কণ*(১৮৭৭), *মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত*(১৮৭৭), *রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা*(১৮৭৯), *সংসার*(১৮৮৬) ও *সমাজ*(১৮৯৪)। *বঙ্গবিজেতা*ও *মাধবীকঙ্কণ*কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে কি না তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও *মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত* ও *রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা* দ্বয়কে ঐতিহাসিক উপন্যাস গোত্রে ফেলা যেতে পারে।[৩২] বাকি দুটি ছিল (*সংসার*ও *সমাজ*) সম্পূর্ণ রূপে সামাজিক উপন্যাস।[৩৩]রমেশচন্দ্র *মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত*ও*রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা*উপন্যাসদ্বয়ে যথাক্রমে মারাঠা ও রাজপুতজাতীয় প্রবল পরাক্রমকে তুলে ধরেছিলেন। বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে মারাঠা ও রাজপুতজাতী সংগ্রাম চালিয়ে নিজেদের স্বজাতির মর্যাদা রক্ষার

ইতিহাসকে তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে রমেশচন্দ্র সমসাময়িক পাঠক সমাজকে ঔপনিবেশিক শাসনের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে জাগ্রত ঘটাতে সাহায্য করেছিলেন।

উপন্যাস রচনায় রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের পাশাপাশি চার্লস স্টুয়ার্টের*History of Bengal*(১৮১৩),গ্রান্ট ডফের *A History of the Mahrattas* (১৮২৬)এবং জেমস টডের *The Annals and Antiquities of Rajasthan* (১৮২৯) দ্বারাও সমান অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ইতিহাসপ্রীতি রমেশচন্দ্রকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। চাকুরীজীবনে দিবারাত্র কাটাতেন ভারতবর্ষের উপর রচিত উক্ত রচনাকারদের ঐতিহাসিক রচনা পাঠের মাধ্যমে। টড প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাসখানি সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকত।[৩৪] রমেশচন্দ্র বলে**ছিলে**ন, 'Byron and Sir Walter Scott were my favourite poets forty years ago.'[৩৫] তবে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে, স্কটের রচনা তাঁকে ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট করিয়েছিল, না ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে স্কটের রচনা পাঠে আকৃষ্ট করিয়েছিল।[৩৬] রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে দেশপ্রীতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যে রমেশচন্দ্রের স্থান

প্রমথনাথ বিশী রমেশচন্দ্রের রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত উপন্যাসের গুরুত্বের দিক বিচার করে তুলনামূলক আলোচনা করে বলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের *রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর, মৃণালিনী* প্রভৃতিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলবার লোভ হলেও তা সংবরণ করা উচিত। যেহেতু এইসব কাহিনীতে ইতিহাস নির্দিষ্ট সীমানাকে অতিক্রম করে গিয়েছেন...কাজেই এইসব গ্রন্থ ঐতিহাসিক উপাদানে গঠিত হলেও ঠিক ঐতিহাসিক পর্যায়ভুক্ত নয়'।[৩৭]

বিশীর মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বিজিতকুমার দত্ত বলেন যে, রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে পুরোপুরি অনুসরণ করেন নি, কোন সার্থকনামা লেখকই তা করেন না। *সংসার* ও *সমাজ* উপন্যাসে যে প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় পাই তার ছোঁয়া বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতে ছিল না।[৩৮] রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের গুরুত্বের দিক বিচার করে বিশী বলেন যে, রমেশচন্দ্র প্রথমেই দেখালেন ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা ও কল্পনার যথার্থ মেলবন্ধন স্থাপন করা প্রয়োজন।

প্রমথনাথ বিশী আরো বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনীর* সমাদর সেকালে অত্যন্ত বেশি ছিল। কিন্তু *দুর্গেশনন্দিনী*খাঁটি রোমান্স। রমেশচন্দ্র যা রচনা করেছিলেন তাও খাঁটি রোমান্স বটে, কিন্তু সেগুলি রোমান্সসর্বস্ব নয়। *দুর্গেশনন্দিনী* প্রকাশ হবার পর অনেক অক্ষম লেখক রোমান্সকে আরো তরল করে পরিবেশন করেছিলেন। রমেশচন্দ্রের রচনা সে দিক থেকে তদানিন্তন বঙ্কিম অনুসরণকারীদের সতর্ক করে দিয়েছিল। সে যুগের পক্ষে এর

মূল্য অপরিসীম। দেশপ্রীতির কথা যথার্থ অনুরণিত হয়েছিল রমেশচন্দ্রের বাংলা উপন্যাস রচনায়। রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে বিশী বলেন,

বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যুগ আবার আসন্ন বলিয়া মনে হয়। সে যুগের বাঙালি লেখকগণকে পুনরায় জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যা মন দিয়া পড়িতে হইবে। তাঁহাদের চোখে ইতিহাসের ও শিল্পরীতির অনেক ত্রুটি ধরা পড়িবে। সেই ত্রুটিগুলি এড়াইয়া চলিতে গিয়া পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকগণ নিজেদের নূতন শক্তির আবিষ্কার করিবেন। একসময়ে রমেশচন্দ্র বাঙালি সাহিত্যিককে দক্ষিণ হাতে ধরিয়া নূতন পথে চালনা করিয়াছেন, এখন আবার বাম হাতে ধরিয়া পুরাতন পথের খালখন্দ এড়াইয়া চলিতে সাহায্য করিবেন। যিনি নূতন পথের চালনা করেন তিনি নেতা, যিনি পুরাতন পথের ত্রুটি সংশোধনে সহায়তা করেন তিনি গুরু। রমেশচন্দ্র একাধারে নেতা ও গুরু দুই-ই।[৩৯]

সুতরাং সমসাময়িক সময়কালে বাংলা সাহিত্যে রমেশচন্দ্র নিজস্ব স্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

‘বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ’-এর সভাপতির পদ অলঙ্কার

ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে বাংলাভাষায় সাহিত্যের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বঙ্গে ‘***বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ*** (**১৮৯৪**)**গড়ে তোলা হয়েছিল।প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের** পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র মারা যাওয়ায় রমেশচন্দ্রকেই পরিষদের দ্বিতীয় সভাপতির পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। **যেসকল ইউরোপীয় ছাত্রগণ ভারতীয় ভাষা নিয়ে চর্চা করতেন তাঁদের সম্মুখে রমেশচন্দ্র পরিষদ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।**

রমেশচন্দ্র বাংলাভাষাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাংলাভাষার মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের ইতিহাসকে ইংরেজি না জানা ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে – যা ঔপনিবেশিক যুগে যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। ২৩শে নভেম্বর, ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে*বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ*-এর সভাপতি হিসেবে রমেশচন্দ্র F.A. ও B.A.তে ঐচ্ছিক বিষয় রূপে মাতৃভাষা পড়ানোর এবং এন্ট্রান্স পরীক্ষায় মাতৃভাষায় উত্তর লেখার সুযোগ দেবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্তস্যার গুরুদাস ব্যানার্জীর উদ্যোগে *Faculty of Arts*২৮শে মার্চ, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে সভায় প্রথম প্রস্তাবটি ২২/১১ ভোটে অনুমোদিত হলেও দ্বিতীয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গিয়েছিল।[৪০]

মাত্র দেড়বছর পরিষদের দায়িত্বে থাকার পর উড়িষ্যায় রাজকার্যে যোগ দেওয়ার জন্য রমেশচন্দ্রকে সভাপতির পদ ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যে পরিষদকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করেছিলেন। 'বস্তুত সেই সময়ে রমেশচন্দ্রের ন্যায় উদ্যমশীল, কর্মঠ, অনুরক্ত, উচ্চপদস্থ নেতার সাহায্য না পেলে পরিষদের জীবনাখ্যায়িকা হয়ত অন্যরূপ গ্রহণ করত।'[৪১]রমেশচন্দ্র ১৩০৯ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯০২-০৩) ইংল্যান্ড থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে পরিষদ তাঁকে দ্বিতীয় বারের জন্য সভাপতিরূপে নিয়োগ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র একদা নিজের গ্রন্থ রাশি পরিষদকে প্রদান করেছিলেন।

সরকারি চাকুরি জীবনে থাকাকালীন বাংলা ভাষা চর্চা ও সাহিত্য রচনার যে কাজ রমেশচন্দ্র শুরু করেছিলেন তা জীবনের শেষার্ধ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্য রচনাকারদের রচনা পাঠ – প্রভৃতি সম্মিলিত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রমেশচন্দ্র বাংলা ভাষায় নিজের সাহিত্য রচনা প্রারম্ভ করেছিলেন। এই সাহিত্য রচনায় তিনি জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-চিন্তা একার্থে তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা ও জাতীয় চিন্তার পরিপূরক হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য তাঁর কাছে গৌরবোজ্জ্বল বলে মনে হয়েছিল। যা তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছিল। আসলে রমেশচন্দ্রের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনার সমন্বয় ঘটেছিল। বেশিরভাগ ইউরোপীয়দের চোখে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী কতখানি নিকৃষ্ট, অসভ্য জাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল তা তিনি সরকারি চাকুরি জীবনে উপলব্ধি করে**ছিলে**ন। তাই ইউরোপীয়দের বিরূপ চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে রমেশচন্দ্র ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং জনগণকে দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন যে ভারতবর্ষেও একদা গৌরবোজ্জ্বল অতীত ছিল যা সময়ের বিবর্তনে বহিঃশক্তির অযোগ্য শাসনে নষ্ট হয়েছে। সরকারি চাকুরি জীবনে সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করা সম্ভব ছিল না। তাই পরোক্ষ মাধ্যম হিসেবে একাধিক ইংরেজি রচনা এবং মাতৃভাষায়রচিত একাধিক প্রবন্ধ, গ্রন্থ, অনুবাদ রচনা ও সাহিত্যের মধ্যে তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছিলেন। মূলত ইংরেজি ভাষা না জানা সাধারণ পাঠকদের মধ্যে জাতীয়তবাদী ভাবমূর্তি জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই রমেশচন্দ্র এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

সূত্র নির্দেশ

১। Chaudhuri, Rosinka. 'The Dutt Family Album and Toru Dutt' in *An Illustrated History of Indian Literature in English*, Arvind Krishna Mehrotra (ed.), New Delhi: Permanent Black, 2003, p. 55.

২। গোস্বামী, শ্রী বীরেশ্বর। 'স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত'।*প্রবাসী। কোলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুস্তাকালয়, আষাঢ় ও শ্রাবণ,* ১৩১৭,পৃ. ২৮৬।

৩। *A History of Civilization in Ancient India*ও *The Literature of Bengal*গ্রন্থের একাধিক অধ্যায় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ*Bengal Magazine*-এ ছাপা হয়েছিল। –**Mukherjee, Meenakshi**.*An Indian for All Seasons:The Many Lives of R. C. Dutt*, NewDelhi: Penguin Books India Pvt. Ltd., 2009, p. 103.

৪। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র (সম্পাদিত)।*বঙ্গদর্শন,* নৈহাটি : বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্র, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, ভূমিকা, পৃ. ১-৩।

৫। Dasgupta,Dr. Kalyan Kumar. 'History in Bengali Literature (19th-20th Centuries)' in *History in Modern Indian Literature*, S. P. Sen (ed). Calcutta: Institute of HistoricalStudies, 1975, pp. 28, 30-1, 34-5.

৬। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র।*বঙ্গদর্শন*। পশ্চিমবঙ্গ, নৈহাটি : বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্র, চৈত্র ১২৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৩৭।

৭। রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন, রায়চৌধুরী, প্রভাতকুসুম ও রায়চৌধুরী, ফুল্লনালিনী (সম্পাদিত), *নব্যভারত,* কলিকাতা : বৈশাখ ১৩০১ বঙ্গাব্দ। ; Dutt, Romesh Chandra.*The Literature of Bengal*, 1877, Reprint, Calcutta: Thacker Spink & Co., 1895, pp. 225-26.

৮। Dutt, R. C. *The Literature of Bengal*, *ibid*, p. 226.

৯। 'These words created a deep impression in me, and two years after this conversation, my first Bengali work, *Bangabijeta,* was out in 1874.' – *ibid*, p. 226.

১০। মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার। 'রমেশচন্দ্র স্মৃতি', *প্রবাসী,শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কোলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুস্তাকালয়, পৌষ,* ১৩১৬(*নবম ভাগ*), পৃ. ৭৪৪।

১১। **মুখোপাধ্যায়, সরোজনাথ।***রমেশচন্দ্রদত্তের জীবনচরিত***। কোলকাতা:এস কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ১৯১৪,** পৃ. **১০১।**

১২।**দত্ত,ড. বিজিতকুমার।** *বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস,***কলকাতা:মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি., ১৪০২,**পৃ. **১২৪।**

১৩। Dutt,R. C. *The Literature of Bengal*, *op.cit,* p. 1.

১৪। যদিও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, 'মানব জাতির ইতিহাসে ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনেকগুলি রচিত হয়েছিল।' –শ',ড. রামেশ্বর।*সাধারণভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*,১৩৯০,পুণমুর্দ্রণ, কলকাতা : পুস্তকবিপণী, ১৪০৩,পৃ. ৫৩২।

১৫। Dutt,R. C. *The Literature of Bengal*, *op.cit,* p. 1.; তবে ড. রামেশ্বর শ' রমেশচন্দ্রের দেওয়া 'পালি' ভাষার সময়কালকে মেনে নিলেও 'পালি' ভাষাকে কথ্য ভাষা হিসেব মানতে নারাজ। ড. রামেশ্বর শ'-এর মতে 'পালি' ছিল কেবল ধর্ম-সাহিত্যের (বৌদ্ধধর্ম) ভাষা। –শ',ড. রামেশ্বর।*তদেব,* পৃ.৫৭৫-৭৭।

১৬। 'In the centuries following the Christian Era. the Pali became gradually replaced bythe Prakrits, the spoken dialects of the people.' –Dutt,R. C. *The Literature of Bengal*, *ibid*, p.1.

১৭। *ibid*, p.3.

১৮। 'The *Magadhi* Prakrit has been modified into the modern Bengali. The Bengalireceived literary recognition in the fourteenth century.' – *ibid*, p.2.

১৯। শ',ড. রামেশ্বর। *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৭৫-৭৭।

২০। দত্ত,রমেশচন্দ্র। 'ঋগ্বেদের দেবগণ: প্রথম প্রস্তাব- ঋগ্বেদের সংহিতা',*রমেশ-রচনাবলী*(দ্বিতীয় খণ্ড), ড. আশুতোষ দাস(সম্পাদক), কলিকাতা : ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ১৯৭৫,পৃ. ৩৪ /

২১। *তদেব,* পৃ. ৩৬।

২২।Gupta, J. N. (Jnanendra Nath). *Life and Works ofRomesh Chunder Dutt*,1911, Reprint, Delhi: Gain Publishing House, 1986, p. 115-16.

২৩। *ibid*, pp. 118-19.

২৪। দত্ত, রমেশচন্দ্র। 'ঋগ্বেদের দেবগণ: প্রথম প্রস্তাব- ঋগ্বেদের সংহিতা',*রমেশ-রচনাবলী*(দ্বিতীয় খণ্ড), *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৭-৩৮।

২৫। দত্ত,রমেশচন্দ্র। 'ঋগ্বেদের দেবগণ: তৃতীয় প্রস্তাব- ঋগ্বেদের সংহিতা',*রমেশ-রচনাবলী*(দ্বিতীয় খণ্ড), *তদেব,* পৃ. ৫৯।

২৬।দত্ত,রমেশচন্দ্র। 'ঋগ্বেদের দেবগণ: পঞ্চম প্রস্তাব- সরস্বতী প্রভৃতি দেবীগণ; ব্রহ্মণস্পতি, বিষ্ণু ও রুদ্র;বিশ্বকর্মা ও প্রজাপতি',*রমেশ-রচনাবলী*(দ্বিতীয় খণ্ড), *তদেব,* পৃ. ৭৮।

২৭। দত্ত,রমেশচন্দ্র।*হিন্দুশাস্ত্র*(প্রথম খণ্ড),কলিকাতা : এল্মপ্রেস, ১৩০২ বঙ্গাব্দ,ভূমিকা, পৃ. ২।

২৮। *তদেব,* পৃ. ভূমিকা, ১।

২৯। ভট্টাচার্য্য, শ্রী আশুতোষ। *বাংলার মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,*কোলকাতা : এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯,পৃ. ৪০৬। ; ভট্টশালী,নলিনীকান্ত। 'প্রতাপাদিত্যের কথা', *ভারতবর্ষ,* ফাল্গুন, ১৯০৩,পৃ. ৩৫৯-৬০।

৩০। মুখোপাধ্যায়,শ্রী নির্মলেন্দু। *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল,*১৯৭৮,পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭,পৃ. ১।; হালদার,গোপাল।*বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা : প্রথম খণ্ড – প্রাচীন ও মধ্যযুগ,*কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ১৪০০, পৃ. ২১২-১৬।; ভট্টাচার্য্য, শ্রী আশুতোষ। *বাংলার মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, তদেব,* পৃ. ৬৫৬।

৩১। দত্ত,রমেশচন্দ্র। 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র', কলিকাতা : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, মাঘ, ১৩০১, *রমেশ-রচনাবলী*(দ্বিতীয় খণ্ড), *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫-৬।

৩২।*Ghosh,J. C. Bengali Literature,*1948, Reprint, *London: Oxford University Press, 1984, p. 165.*

৩৩। **বাগল, যোগেশচন্দ্র (সম্পাদিত)।***রমেশ রচনাবলী,* **১৯৬০, পুনর্মুদ্রণ,কলিকাতা:শিশু সাহিত্য সংসদপ্রা.লি., ২০০২,** পৃ. **৩৩।**

৩৪। মুখোপাধ্যায়, সরোজনাথ।*প্রাগুক্ত,*পৃ. **১০১।**

৩৫। **দত্ত,ড.বিজিতকুমার।** *প্রাগুক্ত,*পৃ. **১২৪।**

৩৬। Dutt,Bhabatosh. 'Romesh Chandra Dutta and The Bengali Literature' in *R. C. DuttCommemoration Volume,Moni Bagchi (ed.), Calcutta: R. C. Dutt* Memorial Committee, 1971, p. 42.

৩৭। বিশী, প্রমথনাথ। *বাংলার লেখক*(প্রথম খণ্ড),**কলিকাতা: বিশ্বভারতী, জন্মাষ্টমী ১৩৫৭,** পৃ. **৩৮।**

৩৮। **দত্ত,ড.বিজিতকুমার।***প্রাগুক্ত,*পৃ. **১২৫।**

৩৯। *তদেব,*পৃ. **১২৬।**

৪০। 'Minutes of the *Faculty of Arts* for the Year 1891-92, C.U.'–**চৌধুরী, সত্যজিৎ**(সম্পাদনা)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সমগ্র* (দ্বিতীয় খণ্ড),কলিকাতা :পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,২০০০,পৃ. ২১০-১১।

৪১। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ। 'রমেশচন্দ্র দত্ত',*সাহিত্য সাধক চরিতমালা,*সংখ্যা ৬৫,কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৪,পৃ. ৩৯।

স্বাধীনতার পঞ্চবার্ষিকী: প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ

Anjan Saha, Maulana Azad College

saha.anjan76@gmail.com

সারাংশ ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গে আজ আমরা সচেতন নাগরিকরূপে সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচন প্রক্রিয়ার অংশীদার, ভারতবর্ষ স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত। কিন্তু কেমন ছিল ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনকালীন পশ্চিমবঙ্গ!সদ্য স্বাধীনদেশের একটি অনভিজ্ঞ অগণিত সমস্যাজর্জর অঙ্গরাজ্য গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষার কতখানি উত্তীর্ণ হয়েছিল এবং কিভাবে, কি ছিল শাসক কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক দলসমূহ, সংবাদমাধ্যম ও নির্বাচকমন্ডলীর ক্রিয়াকলাপ ও মতাদর্শ? আলোচ্য প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে সংখ্যার বিচারে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের প্রারম্ভিক পরীক্ষার চালচিত্র সম্পর্কে, পশ্চিমবঙ্গ নামক ভারতীয় অঙ্গরাজ্যের প্রেক্ষিতে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ, জানুয়ারীর প্রথম তিন সপ্তাহে, 'জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫১)' অনুসারে এবং সংবিধানসম্মতভাবে ভারতের নির্বাচন কমিশনের পরিচালনাধীনে - জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষনে (২২.১.১৯৫১) প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর ভাষায় যা ছিল প্রজাতন্ত্রের গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তিস্বরূপ *(The Statesman 1951: November 23)*। রাজ্যে ঐ বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনে নিয়োজিত হয়েছিল প্রায় ১৮,০০০ ভোট কেন্দ্র, তিন লক্ষ ব্যালট বাক্স এবং ২.৬৩ কোটি ভোটপত্র *(Bandopadhyay 2009: 154)*। বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচন একত্রে সংঘটিত হওয়ায় এবং একাধিক প্রতিনিধি বিশিষ্ট আসনের উপস্থিতির কারণে সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি ছিল যথেষ্টই জটিল, বিশেষত যখন জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ ছিলেন অক্ষরজ্ঞানশূন্য *(Bagchi 1998: 2973)* । অনভিজ্ঞ নির্বাচকমন্ডলীকে বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহগুলোতে নিয়মিত কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের দ্বারা প্রযোজিত সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্যচিত্র পরিবেশিত হত, আকাশবানীর কলকাতা কেন্দ্র থেকেও সম্প্রচারিত হত নির্বাচন সম্পর্কিত বিবিধ অনুষ্ঠান *(যুগান্তর ১৯৫১: নভেম্বর ১৬ এবং The Statesman 1951 : December 14)*।

তদানীন্তন সদ্যস্বাধীন দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিপুল প্রতিপত্তিজনিত কারনে বিরোধী দলগুলি স্বাভাবিকভাবেই প্রক্রিয়াটির নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয়ী ছিলেন । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে রক্ষিত ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর নথি অনুসারে (Serial No.119/24, File No.353/24)মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের উদ্দেশ্যে ২৬/০১/১৯৫২ তারিখে লিখিত পত্রে সোসালিস্ট পার্টির শিবনাথ ব্যানার্জি অভিযোগ জানান যে, সাধারণ ভোটার ও বিরোধী দলীয় কর্মীদের পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা ভীতিপ্রদর্শন করছেন । কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে মুজাফফর আহমেদ পক্ষপাতমূলক সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিরোধী দলীয় প্রচারাভিযান রুদ্ধ করার অপচেষ্টার সম্পর্কে সরব হন । মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অবশ্য যথাক্রমে সরকারি